রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি

জয়ন্ত সিংহ

পরিবারই আধুনিক সমাজের ভ্রূণরূপ। একসময় মানুষ একা একা জঙ্গলে ঘুরে খাদ্যের সন্ধান করত। হিংস্র জন্তু থেকে শুর করে বন্য মানুষ পর্যন্ত মানুষকে আক্রমণ করত। এভাবেই একদিন মানুষ বাঁচার প্রয়োজনে যূথবদ্ধ হয়েছে, সমাজবদ্ধভাবে থ াকতে শিখেছে। তারও আগে প্রাথমিক স্তরে পরিবারই ছিল যুথবদ্ধ সমাজ গঠনের আদি রূপ। জর্মন উপজাতি 'বর্বর' যুগের চূড়ান্ত বিকাশের সময়কালেই আমরা সভ্যতার ঊষাকাল হিসেবে ধরে থাকি, মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধুনদের তীরে এবং চিনের হোয়াং হো নদীর তীরের সভ্যতার উন্মেষ ঘটে যে ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, সবগুলিতেই কমবেশি 'অ্যাবসলিউট মনার্কি' কায়েম ছিল। রাজাদের কোথাও বলা হত 'ইসাক', কোথাও 'ফ্যারাও', কোথাও 'মান্দারিন' (ঠিক রাজা নয়, অমাত্য) ইত্যাদি। পরে ধ্রুপদি যে রাষ্ট্রের রূপ দেখা যায় আথেন্সে তাতে খুব স্পষ্টভাবে রাষ্ট্র গড়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। আথেন্সে গোড়ায় অলিগর্কিগুলির কাজে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে এর প্রতিকার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই থিমিউসের ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী এক কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম করে সাধারণ পরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। গ্রিসের পাশাপাশি রোমেও এমন রাষ্ট্র, সরকার গড়ে ওঠে। তখন থেকেই আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের ন ানারকম ভাবনাচিন্তা বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়। অ্যারিস্টটল বললেন, রাষ্ট্র ছাড়া যে মানুষ বাস কর ার কথা ভাবে সে হয় পশু অথবা অতিমানব।

কীভাবে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, এই বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলে গেছেন। পরিবার থেকেই ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে - গোড় ায়বলেছিলেন অ্যারিস্টটল। পরে জর্মন দার্শনিক ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস এবং আরও পরে ইংরেজ দার্শনিক স্যার হেনরি মেন এই কথা বলেন। তবে এঙ্গেলস যুক্তিনিষ্ঠাভাবে ব্যাখ্যা রাখেন। তিনি বলেন, সমাজের বিকাশের একস্তরে সমাজেরই ফল হিসেবে আবির্ভাব হয়েছে রাষ্ট্রের। এঙ্গেলস বলেছেন, "সমাজ যখন নিজের মধ্যেই সমাধানের অযোগ্য দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে এবং অমীমাংসাযোগ্য বিরোধ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে তখন অর্থনৈতিক স্বার্থবিশিষ্ট বিবদমান শ্রেণি নিষ্ফলা যুদ্ধে সমাজকে ন া জড়াতে, এমন এক ক্ষমতার প্রয়োজন অনুভব করে, যা সমাজের ঊর্ধে থেকে এই দ্বন্দ্বে স্রেফ মধ্যস্থতা করে যাবে এবং এই দ্বন্দ্বকে এক শৃঙ্খলার বেড়ি পরিয়ে রাখবে। সমাজ থেকেই সৃষ্টি অথচ সমাজের ঊর্ধে যার স্থান, এই শক্তিই হল রাষ্ট্র। ক্রমেই এই শক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।"

রাষ্ট্র ঐশ্বরিক আশীর্বাদেই সৃষ্টি। এমন মত পোষণ করেছিলেন জি ডবলিউ এফ হেগেল। তিনি বললেন, 'রাষ্ট্র এক স্বর্গীয় ধ ারণা বিশেষ। রাষ্ট্র মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার বাহ্যিক প্রকাশের এক নামান্তর।" টমাস হব্‌স, জন লক এবং জাঁ জ্য াকুইস শো অনুমান করেছেন, মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচতে চুক্তির মধ্যে দিয়ে কাউকে রাজা নির্বাচন করে। হব্‌স অবশ্য রাজাকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলে ব্যাখ্যা করেন। হব্‌স যে প্রকৃতির রাজত্বের বর্ণনা দিয়েছেন লকও তাঁর 'সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে এমনই রাজত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনিও মনে করেন, দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বিত্ত সীমিত রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। ফরাসি লেখক শো তাঁর 'দ্য সোশ্যাল কনট্যাক্ট' গ্রন্থে বলেছেন, রাষ্ট্র গঠনের আগে পৃথিবীতে যে অবস্থায় মানুষ বাস করত তা ছিল মর্ত্যের স্বর্গ। কিন্তু সম্পত্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ - নীচ ভেদাভেদ জন্মায়, জন্ম ায় বিরোধ। সেই অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে মানুষ সাধারণ ইচ্ছার হাতে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করল। এই সাধ

ারণ ইচ্ছা বা সমষ্টিগত ইচ্ছাকেই তিনি রাষ্ট্রের সবের্বাচ্চ রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। হব্‌স, লক এবং শোর মধ্যে শোই মে াটমুটি গণতান্ত্রিক সমাজে -- একথা জন লকও বলে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি হল There can be no injury, where there is no property. অর্থাৎ সম্পত্তি যখন ছিল না, তখন সমাজে কোথাও হানাহানি ছিল না। অবশ্য একেবারেই ছিল না। বললে ভুল হবে। হবস কথিত প্রকৃতির রাজত্বে খাদ্য নিয়েই হানাহানি ছিল মানুষে - মানুষে। তবে সে হানাহানি তখনই চরম রূপ নেয় যখন আমার ঘোড়া, আমার গ, আমার জমি ইত্যাদি কথা মানুষ ভাবতে শেখে।

পাশাপাশি কার্ল মার্কস, ভলাদিমির ইচিল উলিয়ানভ লেনিন 'রাষ্ট্রকে দমনপীড়নের যন্ত্র' বলে গেলেন। কার্ল মার্কস বলেছেন--- 'রাষ্ট্র হল শ্রেণিশাসনের যন্ত্র। এক শ্রেনির অন্য শ্রেণিকে পীড়নের যন্ত্র।' লেনিন স্পষ্ট করে বলে গেছেন, "রাষ্ট্র হল বলপ্রয়োগেরসংগঠনমাত্রা। এক শ্রেণিকে অন্য শ্রেণি পীড়ন করার জন্য রাষ্ট্রের মতো হিংস্র সংগঠনের আশ্রয় নেয়।" মহাত্মা গান্ধীও বলে গেছেন 'রাষ্ট্র হচ্ছে নির্যাতনের যন্ত্রমাত্র।' তাই তিনি রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করে সামাজিক অছি পরিষদের ম াধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত সর্বোদয় সমাজ গড়ার কথা বলে গেছেন। উড্রো উইলসন বলেছেন, A State is a people organized for law within A definite territory. 'ইনট্রোডাকশান টু পলিটিক্স' গ্রন্থে হ্যারল্ড ল্যাস্কি বলেছেন, রাষ্ট্র ম ানুষের আচার নিয়ন্ত্রণের এক মাধ্যম। লাস্কির মতো, রাষ্ট্র এমন একজনপ্রতিষ্ঠান, যা নির্দিষ্ট পথে চলে এবং প্রয়োজনে বলপ্রয়াগের দ্বারা সকলকে সেভাবে চলতে বাধ্য করে।

এ তো হল রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রর পরিণতি কী হল? আমরা দেখল াম, অবাধ রাজতন্ত্র বা absolute monarchy-র ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলির একে একে পতন হল সারা দেশে। ধীরে ধীরে অজস্র যুদ্ধ, হাতবদল, হানাহানি এবং রক্তপাতের পর্ব পার হয়ে রাষ্ট্র সর্ভশক্তিমান এক শক্তি হিসাবে মূর্ত হয়ে উঠল সারা বিশ্বে। ঘটনার ঘনঘটায় রাষ্ট্র তার নখদন্ত বিকশিত করে আমাদের জানিয়ে দিল despot state এর সংজ্ঞা । এর পাশাপা শি কেউ কল্যাণকর রাষ্ট্রের কথা বললেন। কিন্তু বাস্তবে সেই ধরনের কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায়নি। বরংএই সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠল, রাষ্ট্র এমন এক শক্তি, যাকে যে কেউ নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে। যে ভয় বা আশঙ্কা হ্যারল্ড লাস্কির মতো অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই করেছিলেন তাই সত্য হল। যে গোষ্ঠী রাষ্ট্রক্ষমতা কব্জা করল, সেই গোষ্ঠী অন্যদের পদদলিত করে পীড়ন করার যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগাল রাষ্ট্রকে। আধুনিক বিশ্বে এটিই রাষ্ট্রের সাধারণ রূপ হিসেবে উঠে এসেছে। একথা সত্য, আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ভারত সব দেশেই। এমন কী যেদেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতা ন্ত্রিক ধ্যান - ধারণা বহাল বলে দাবি করা হয় সেখানেও একথা সত্য। লেনিন নিজেই বলে গেছেন, সমাজতন্ত্র হল শ্র মিকশ্রেণির একনায়কত্ব। 'একনায়কত্ব' শব্দটির অর্থ যে অন্য শ্রেণিগুলির স্বার্থ প্রয়োজনে দমন - পীড়ন করা তা সোজ াসুজিই বলে গেছেন তিনি। চিনে ফালুঙ গোষ্ঠীর প্রবক্তারা প্রচার করে, 'এব্বি অমুক দিনে ধবংস হয়ে যাবে।' তারা মানুষকে জ্যোতিষে বিশ্বাস করতে শেখায়। তারা মানুষের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়,তাকে ঈশ্বরনির্ভর করে তোলে। চিনের যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় তারা মনে করে -- এসব কাজ অনৈতিক, মানুষকে পিছিয়ে দেয়। তাই চিন ফালুঙ গোষ্ঠীর প্রবক্তাদের উপর দমনপীড়ন চালায়, লাঠি চালায়, জেলবন্দি করে, শাস্তি দেয়। এসব করা অবশ্যই পীড়ন এবং তা চিনা রাষ্ট্র করে। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমেরিকার আফগানিস্তান এবং ইরাকে আত্রমণ চালানো যত কর্কশভাবে পীড়নকে চিনিয়ে দেয়, এ পীড়ন কি তত কর্কশ? তা না হোক পীড়ন, পীড়নই। অথাৎ রাষ্ট্র পীড়নেরই যন্ত্র। যে শ্রেণিগোষ্ঠী এই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে তারাতা কাজে লাগায়।

গোড়ায় যখন রাষ্ট্র সংত্রান্ত ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে তখন অনেকে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। যেমন, গ্রিক দার্শনিক প্লেটে া। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রে ছবি এঁকেছেন যে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিই হবে সুবিচার। প্রত্যেকে তঁ ার কর্তব্য পালন করবেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখদুঃখের শরিক হবেন, কেউ কারও প্রতি অনাচার করবেন না, কেউ কারও সঙ্গে বিবাদে বিরোধে শামিল হবেন না। হলে তা মেটানোই রাষ্ট্রের কাজ হবে। রাষ্ট্র প্রকৃতই মানবদরদী হবে। ঈশ্বরের প্রভ াবে বিশুদ্ধ চরিত্র এবং নির্মল জ্ঞানের অধিকারী হবেন আধুনিক রাষ্ট্রের মানবসমাজ। প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলে গেছেন, তা বাস্তবিকই হলে আমরা খুশি হতাম। কিন্তু তা হয়নি। তিত্ত সত্য ঠিক এর বিপরীত। আরও দুঃখের হল, প্লেটো এই আদর্শ রাষ্ট্রত গড়ায় নেতৃত্ব দেবেন বলে সিসিলি দ্বীপকে বেছে নিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে আসেন। ইতিহাসের প্রহসন হল, আজ সিসিলি মাদক - মাফিয়া এবং পেশাদার খুনিদেরে স্বর্গরাজ্য। বিশ্বে কেউ এত এগিয়ে নেই। ভা

গ্যিস প্লেটো বেঁচে নেই!
শুধু প্লেটো নন, তৎকালীন অনেক দার্শনিক এবং সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় এমন স্বপ্নরাষ্ট্রের কথা লিখে গেছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনে এই স্বপ্নরাষ্ট্র এখনও স্বাদ পায়নি পৃথিবী। 'রামরাজ্য' যদি সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে বাস্তবভূমিতে নেমে আসত, হয়তো তাহলে আমরা ধন্যই হতাম। তা হয়নি। হয়নি বলেই আজ 'কল্যাণকার রাষ্ট্র' শব্দদুটি সোনার পাথরবাটির মতো লাগে।

।। রাষ্ট্র ও ব্যক্তি ।।
কোনও দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির দুটি সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত আমি ভারতীয়, তাই ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে আমি একাত্ম। দ্বিতীয়ত, আমি একজন ব্যক্তি। আমার স্বাধীন চিন্তাভাবনা রয়েছে। এদিক থেকে আমার সত্তা রাষ্ট্রের অতীত। ধরা যাক, আমি এমন এক সংগঠনের সদস্য, যার সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধের ভিত্তি রয়েছে। রাষ্ট্র যদি সেই সংগঠনকে পীড়ন করে আমি রাষ্ট্রকে না ও সমর্থন করতে পারি। এখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে আমার বিরোধের জমি তৈরি হতে পারে। এজন্যই হ্যারল্ড লাস্কি বলেছিলেন, "রাষ্ট্র জনসাধারণের জন্য কী করছে, তার উপরেই তার আনুগত্য পাওয়া না - পাওয়া নির্ভর করছে।" এখানেই কাজ করে বিচ্ছিন্নতার সূত্র। রাষ্ট্র বলতে সাধারণ মানুষ তার সংগগঠনগুলিকে বোঝেন। সেই সংগঠনগুলি যখন মানুষের আশা - আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পারে, তখন রাষ্ট্রে সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়তে বাধ্য। যেমন, আমেরিকায় যে কোনও সরকারি কর্মী অবসর নিলে (৬৫ বছর বয়সে) মাসে ৮৪৫ ডলার পেনশন পাওয়ার বিধান রয়েছে। প্রতিবন্ধী হলে যে কোনও বয়সেই এই মাসিক পেনসন পাবেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ১৮বছরের কমবয়স্ক পুত্রকন্যা বা নাতি - নাতনি থাকলে তার জন্যও ভাতা পাওয়া যায়। এসবই বিমা হিসেবে পাওয়া যায়। কোনও কর্মীরঅবসরের আগেই মৃত্যু হলে তার স্ত্রী - পুত্র- কন্যাও এই বিশেষ সুবিধা পায়। আবার যেসব মানুষ নিজেই ব্যবসা করেন, চাকরি করেন না তাদের জন্যও সামাজিক সুরক্ষা বিমা রয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, বাড়ির কাজের লোকেরও এই বিমার বন্দোবস্ত রয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিমার বন্দোবস্ত রয়েছে। নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রের এই যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, এর জন্য সুবিধাভোগীরা নিশ্চিত কৃতজ্ঞ থাকেরাষ্ট্রের প্রতি। আবার এই রাষ্ট্রই যখন ঝুটমুট অজুহাত তুলে আফগানিস্থান - ইরাক আত্রমণ করে দেশের প্রতিরক্ষা খরচ এমন হারে বাড়িয়ে তোলে যে মুদ্রাস্ফীতি চড়চড় করে বাড়তে থাকে, তখন একজন সাধারণ আমেরিকান স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের প্রতি আর একাত্তম অনুভব করে না। না করাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, স্বার্থের নিরিখে। মানুষযদি দেখে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত নেই রাষ্ট্রের হাতে, তখন সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর আর কোনও বাড়তি প্রেম থাকতে পারে না। অনেকসময় উগ্র দেশাত্মবোধ উসকে এসব স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার পরও রাষ্ট্রের আচরণের প্রতি মানুষকে অন্ধ করে তোলার চেষ্টা হয়। এই প্রয়াস সাময়িক সফল হলেও স্থায়ীভাবে সাফল্য মেলে না। আমেরিকার ইয়াঙ্কি দার্শনিক হেনরি ডেভিড থো এসব দেখেশুনে এক গ্রন্থ লিখে গেছেন। এই গ্রন্থে নাম 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স'। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, কেন তিনি দাসত্বের মদতদাতা সরকারকে কর না দিয়ে জেলে থাকাকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। ওই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "দ্যাট গভর্নমেন্ট ইজ বেস্ট হুইচ গভর্নস নট অ্যাট অল।" অর্থাৎ সেই সরকারই সেরা, যে একেবারেই শাসন করতে জানে না। তিনি বলেছিলেন, যতদিন না রাষ্ট্র ব্যক্তিকে উচচতম ও স্বাধীন শক্তি হিসেবে স্বীকার করবে ততদিন প্রকৃত মুক্ত এবং আলোকপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের জন্ম হবে না। রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে যে, তার সর্বময় ক্ষমতা এবং কতৃর্ত্বের উৎস ব্যক্তিই।
থো যেভাবে ভেবেছেন, সবাই সেভাবে ভাবেননি। তিনি ব্যক্তির ভূমিকায় অতিরিক্ত গুত্ব আরোপ চেয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বিরোধিতার ভিত্তিতে নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কের ভিত্তিতে। সেই স্বার্থ বিঘ্নিত হলে ব্যক্তি - রাষ্ট্র সম্পর্ক বিষময় হয়ে যায়।

।। সমাজ ও ব্যক্তি।।
আমি এক ব্যক্তি। আমার মতো অসংখ্য ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে সমাজ। মানবপ্রকৃতি বিচিত্র ধরনের। এক একজন মানুষের কাছে পছন্দের জগৎ ভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন, বেঁচে থাকার অর্থও ভিন্ন। এই অসংখ্য ভিন্নতা লয় পায় এক সমাজে। উৎপ

াদনরীতি, উৎপাদন - সম্পর্ক অথবা বস্তুজগতের সঙ্গে ঘাত - প্রতিঘাতে গড়ে উঠছে ব্যক্তিমানস। আবার সেই ব্যক্তি - ম ানস সমাজমানসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হচ্ছে। সমাজমানস এমন অসংখ্য ব্যক্তিমানসের যোগফল। কিন্তু নিরন্তর ব্যক্তিম ানস এবং সমাজমানসে দ্বন্দ্ব জিইয়ে থাকে। ব্যক্তিমানসকে সমাজমানসের সঙ্গে আপস করতে হয়। যেখানে আপস করতে পারে না ব্যক্তিমানস, সেখানে সমাজের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতার জমি তৈরি হয়। ক বাবু সমাজের শিক্ষিত - মার্জিত ব্যক্তি। তিনি ভাল প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, ছেলেমেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করেন,প্রতিদিন বাজারে যান, পাড়ার ক্লাবের সভাবতি, একটু - আধটু মদ্যপান করেন তিনি। এইসব কাজ করায় সমাজের সঙ্গে সম্পর্কপাতে তাঁর সমস্যা হয় না। কেউ অপিসে গেলে প্রশ্ন করে না, কেন অফিসে যাচ্ছেন? কারণ যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বরং না গেলেই কৌতুহল হয়, কেউ জানতে চায় কিন্তু এই ক বাবু-ই যদি সমাজে চলমান ধারার উল্টোমুখী কোনও কাজ করেন, তখনই বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ধরা য াক, ক বাবুর কোনও নিকট আত্মীয় প্রয়াত হলেন। আমাদের হিন্দু বাঙালি সমাজের নিকট - আত্মীয়ের প্রয়াণের পর যেসব ক্রিয়াকর্ম করার বিধান রয়েছে, তা ক' বাবুকে মানতে হবে। না মানলে সমাজের সঙ্গে তার বিরোধ তৈরি হবে। সমাজ বলবে, কেন আপনি প্রচলিত নিয়ম অমান্য করলেন?

এই ক্ষেত্রটাই মজার, আমি সমাজেরই অংশ, আমাকে নিয়েই সমাজ। আমার চিন্তা, আমার মতো লক্ষ ব্যক্তির চিন্তাধারা মিলেই সমাজমানস তৈরি হচ্ছে। আবার সেই সমাজমানসের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ তৈরি হচ্ছে প্রায়শই। কেন এমন হয়? কারণ সমাজমানস থেকে ব্যক্তিমানস সবসময়ই এগিয়ে থাকে। ব্যক্তিমানস নিয়েই সমাজমানস নির্মিত হয়। আবার সেই সমাজমানসই ভাঙতে উদ্যোগী হয় ব্যক্তিমানস। ভাঙেও, বদলায়।

মনে রাখতে হবে, পার্থক্য মানেই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বতত্ত্বের এ এক গুত্বপূর্ণ কথা। আমি, মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্রকন্যাদের নিয়ে পরিবার। পরিবার একটি নিউক্লিয়াস সমাজের চোখে। আবার পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব আছে। বাবা মাকে খুব ভালবাসে। বাবা - মায়ের মধ্যে কখনও ঝগড়া হয়নি কেউ কাউকে কখনও অপমান করনি। তা সত্ত্বেও দ্বন্দ্ব রয়েছে বাবা - মায়ের মধ্যে। কারণ পার্থক্য মানেই দ্বন্দ্ব। আমি আর তুমি যে স্বতন্ত্র, এর আর্থই আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্ব অবস্থানের। তাই দুজনের চি - সংস্কৃতি -অভ্যাস হুবাহু একই হলেও এক দ্বন্দ্ব থাকে। এই দ্বন্দ্ব অ্যান্ট াগনাস্টিক হতে পারে। আবার নন অ্যান্টাগনাস্টিকও হতে পারে। দ্বন্দ্ব দু'রকমের হতে বৈরিমূলক ও অবৈরিমূলক।

ব্যক্তিতে - ব্যক্তিতে পার্থক্য এবং অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব নিয়েই গড়ে উঠেছে বৃহত্তর সমাজ। কিন্তু সমাজ গড়ে ওঠার সময় এক সহমতের ভিত্তিতে তা নির্মিত হয়। সহমত কী ধরনের? (১) সমাজে ব্যক্তি থাকবে, আবার পরমায়ু শেষ হলে তার মৃত্যুও হবে। তখন নতুন ব্যক্তি সমাজে আসবে। ব্যক্তির এই যোগ - বিয়োগ সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে।

(২) সামাজিক জীবনের মাত্রা কতটা কী হবে, তা মোটামুটি এক পরিমাপক তৈরি হয়ে যায়। স্থির হয়ে যায় প্রত্যকের অ াত্মমর্যাদা নিয়ে থাকার পরিবেশ কী হবে, তার শর্তগুলি। প্রত্যেকে যেমন প্রয়োজনমতো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান পায়, এও এক শর্ত। নয়তো সমাজে থাকবে কেন ব্যক্তি?

(৩) সমাজজীবনের মুখোমুখি কীভাবে চলতে হবে, তা ব্যক্তি জেনেবুঝে জন্মগ্রহণ করে না। অভিজ্ঞতার এবং ইতিহাসের নিরিখে তার শিক্ষা হয়ে যায়।

(৪) ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগের মাধ্যম ঠিক হওয়া চাই। একসময় আদিম সমাজে সংকেত ব্যবহার করে যোগাযোগ বজায় রাখত। এখন উন্নত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এও সহমতের অন্যতম উপাদান।

(৫) বিশেষ বিশেষ কাজের ধরনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে। আদিম সমাজে পর্যন্ত যখন সেকেলে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হত, তখনও প্রতিটি ব্যক্তির বয়স এবং লিঙ্গের নিরিখে শ্রম নির্দিষ্ট করা ছিল।

(৬) জন্মের পর শিশুর বিকাশে সমাজ - পরিকাঠামোর ভূমিকা অপরিসীম। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের পরম্পরায় সে যত বড় হয় সমাজের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতেই তার চিন্তাভাবনার জগৎ তত পরিণত হয়। একেই বলে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ। তাহলে এটাও সমাজ গড়ে ওঠার অন্যতম শর্ত যে, ব্যক্তির সামাজিকীকরণের যোগ্য সুস্থ পরিবেশ থাকতে হবে।

(৭) উৎপাদনের নির্দিষ্ট পদ্ধতির সম্পর্কে ধারণা ছাড়া কোনও সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তির পার্থিব চাহিদা পূরণেরযোগ্য সাংগঠনিক এবং প্রায়োগিক পরিবেশ থাকতেই হবে। পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গদের উৎপাদনী প্রযুক্তি বংশগতভাবে স্থির করা থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণ এবং তালিমের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞ

ানলাভ সম্ভব। ব্যক্তিকে শুধু নিজের ভূমিকার কথাই জানলে চলবে না। সমষ্টির স্বার্থে'র কথাও তাকে ভাবতে হয় । সহমতের এও এক অন্যতম শর্ত।

(৮) উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বন্টনের পদ্ধতিও। সমাজ সমষ্টিগতভাবে যা উৎপাদন করল তা সমাজের সব সদস্যের মধ্যে যথাযথভাবে বন্টিত হওয়া চাই। বন্টনে অসাম্য বৈষম্য হলেই সৃষ্টি হয় উত্তেজনার। তার চেয়েও বড় কথা, সমাজে এমন অনেক সমষ্টি থাকে, যারা এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেবে না। যেমন, শিশুরা, অসুস্থরা, প্রতিবন্ধীরা। এরাও যাতে সমাজের সম্পদন হিসাবে সমষ্টিগত উৎপাদনের ভাগ পায় তা দেখতে হয়। এও এক অন্যতম শর্ত।

(৯) পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, সমাজ মানেই অজস্র ভিন্নমুখী এককের সম্মিলন। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, এই 'একক' অর্থাৎ ব্যক্তির চিন্তাভাবনা সামাজিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে দ্বন্দ্বে যেতেই পারে। সেই বিরোধ থেকে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মনীতি শেখে। ব্যক্তি জেনে যায় তার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকারও। কোনও ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির আচার - আচরণ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তার প্রতিবিধানে ব্যবস্থও রাখতে হয় সমাজে। এজন্যই সামাজিক বিধিনিষেদ ও শৃঙ্খলা, সমাজ - সংগঠন যা নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ কখনও নৈরাজ্য কামনা করে না। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ শান্তিতে বাস করতে চায়। তাই এই বিষয়েও সহমতের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয় সমাজ।

সমাজের প্রচলিত নিয়মনীতি না মানা অন্যায় -- একথা বলছি না। বরং চিরকাল বিদ্যমানতার বিদ্ধে লড়াই করেই গড়ে ওঠে নতুন চিন্তাভাবনা। বিদ্যমান সমাজ তা মানে না। বিদ্ধবাদীকে জেলে পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। অনেক পরে প্রমাণিত হয়, যিনি বিদ্যমানতার বিদ্ধতা করেছিলেন, তিনিই ঠিক। এমন দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি রয়েছে ইতিহাসে। অথাৎ ব্যক্তিমানসের যোগফলে গড়ে ওঠা সমাজমানসের একটি সময় পরিবর্তনের আর্জি ওঠে ব্যক্তিমানসের তরফ থেকেই। চক্রের মতো এই ঘটনাপ্রবাহ হয়ে চলে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় এসব।

অনেকে বলেন, ব্যক্তির সমাজমানস গঠনে পরিবেশের থেকে জেনেটিকস বা বংশগতির প্রভাব বেশি। বিদেশের সমাজতাত্ত্বিকরা এডুইন এবং ফ্রেড নামে যমজসন্তানকে দু'দেশে রেখে মানুষ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, দুই ছেলে ভিন্ন সমাজে বাস করেওবাবার অনেক গুণই পেয়েছে। এর বিপরীত সমাজতাত্ত্বিকরা আবার হেলেন এবং ক্ল্যাডিস নামে দুই যমজ সন্তানকে ২০ বছর ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন সমাজে মানুষ করে প্রমাণ করেন, মেয়েটি অভিজাত পরিবেশে বাস করে এরকম হয়েছে। আর ছেলেটি (ক্ল্যাডিস) মধ্যবিত্তপরিবারে বাস করে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়েছে। আসলে ব্যক্তিমানস গঠনে জেনেটিকসকে গুত্ব দেওয়াটাই ভ্রান্ত ধারণা। তাহলে নেতাজিত সুভাষচন্দ্র বসুর মেয়ে অষ্ট্রিয়া বা জার্মানিকে না ভালোবেসে কলকাতাকেই নিজের বাসস্থান করে নিতেন। ব্যক্তি যে পরিবেশে বাস করে সেই পরিবেশই তার মনন গঠনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কপাতে এও এক গুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com